ইত্তেফাক

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

(১৭শ পৃঃ পর)

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা এখন নতুন ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মুখোমুখি হচ্ছে। ভাষা উপাত্ত এখনও অডিও, ভিডিও, সিডিতে কম্পিউটার সংরক্ষিত হচ্ছে এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ভাষা পদ্ধতির সঙ্গে রক্ষা করতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এই ধরনের কাজে কম্পিউটার বিজ্ঞানী, ভাষা বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, লিপি-বিশারদ, পদার্থবিদ, নিউরো সায়েন্টিস্টদের নিয়ে গবেষণা টিম গঠন করতে পারে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুইভাগে ভাগ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। এটি ১৯৭২ সনের সংবিধানের একটি মৌলিক ধারা। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে সংবিধান প্রণীত হয়ে তারপর বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার পর সংবিধান প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ সনে, সংবিধান প্রণীত হয়েছে ১৯৭২ সনে। সংবিধানে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। এ ধারা সংযোজনের পেছনে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের কাহিনী লুক্কায়িত আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সেই সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার অধিকার আদায় করার সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন বরকত, রফিক, সালাম, শফিক, জব্বার এবং আরও নাম না-জানা অনেকেই। তাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেদিনের সহিংহারা পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ সম্বিৎ ফিরে পান। মাতৃভাষার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। ঔপনিবেশিক যুগে মানুষের সেই অধিকারের স্বীকৃতি ছিল না। তখন শাসকশ্রেণীর ভাষা ছিল এক আর সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল আরেক। ব্রিটিশ শাসকদের ভাষা ছিল ইংরেজী- একটি বিদেশী ভাষা। আইনের ক্ষেত্রে, বিচারের ক্ষেত্রে, প্রশাসনের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বিদেশী ভাষা প্রচলিত থাকাতে মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ, ন্যায়বিচার পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য এবং শিক্ষা লাভ করার সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হলে বিদেশী ভাষার আধিপত্যের অবসান হবে এই ছিল মানুষের আশা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ভাষা প্রশ্নটি তীব্র আকার ধারণ করে। তখনকার শাসকশ্রেণী বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগত ক্ষোভ ছিল তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। তারা ইংরেজীর স্থলে উর্দুকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করে। উর্দু তখনকার দিনের পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের মাতৃভাষা ছিল না। আর বাংলা ভাষা ছিল সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার আগে থেকে দেশের পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক মাতৃভাষার অধিকারের কথা শাসকশ্রেণীর বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদ, বিশিষ্ট শিক্ষক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আব্দুল হক এবং আরও অগণিত ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিক মাতৃভাষার অধিকারের যুক্তি বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লেখেন, মতামত প্রচার করেন এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য দাবী উত্থাপন করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত হয়। কিন্তু তদানীন্তন সরকার ব্যাপক জনগণের এই দাবীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তখন পশ্চিমের কোনো কোনো দেশে এক জাতি এক ভাষা One nationa one language' নীতি খুব জনপ্রিয় ছিল। শাসকশ্রেণী এই নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে 'উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'- এইরকম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত সেদিনের জাগ্রত ছাত্র-শিক্ষক সমাজ, রাজনৈতিক কর্মী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভাষাআন্দোলনের মধ্যে মানুষের মৌলিক অধিকারের দাবী অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বপাকিস্তানের মানুষের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এক কথায় তাদের জীবনযাত্রার স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত তীব্রভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থান লাভ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের কাছে দাবী তুলে ধরেন। সরকার এই দাবীর তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হলে সমগ্র প্রদেশব্যাপী গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনকে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন বলে উল্লেখ করা হয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভাষার দাবীতে আন্দোলন হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতেও ভাষার দাবীতে আন্দোলন হয়েছে কিন্তু বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল ১৯৪৮-১৯৫২ সালে সেরকম ব্যাপক আন্দোলন আর কোথাও হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে পৃথিবীর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার উপর যে গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে তাতে যাঁরা আত্মবিসর্জন দেন তাদের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছিল।

ঘটনাটি ছিল বিয়োগান্তক, ছিল বিষাদাত্মক। ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যু ঘটেছিল কয়েকজন নিরপরাধ সংগ্রামী মানুষের। তাঁরা শহীদ হয়েছিল তাঁদের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের দাবীতে পরিচালিত আন্দোলনে। এই আন্দোলনের সাধারণ নাম ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন। ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী এই জনপদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তরের ঘটনা একটি ইতিহাসের পালাবদলের সূচনা। বিগত পঞ্চাশ বছরের একুশে ফেব্রুয়ারীর বিয়োগান্তক অথচ গৌরবোজ্জ্বল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণী নানাজনে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনার পূর্বাপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে বদরুদ্দীন ওমরের 'ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', বশীর আল-হেলালের 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একুশের আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্মৃতিচারণমূলক বই লিখেছেন অনেকেই, আহমদ রফিক, আব্দুল মতিন, রফিকুল ইসলাম, গাজীউল হক, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং আরো অনেকেই। একুশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে যে সঙ্কলনটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে সেটা হচ্ছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব স্বল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে যে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে, তার কালক্রমিক পর্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই আন্দোলন থেকে যে অধিকার-চেতনার জন্ম হয়েছে তার ফলে এই জনপদে একটি সমাজ-ঐতিহাসিক ঐক্যবোধের জন্ম হয়। এই ঐক্যবোধ সর্বস্তরের মানুষকে একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে। এই ঐক্যবোধ উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে প্রতিফলিত হয়েছে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। নয় মাসের যুদ্ধে মানুষের মধ্যে যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল তাতে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে একটি প্রাণচঞ্চল স্বকীয়তার উপলব্ধি। তাঁরা সৃষ্টি করেছেন নতুন কবিতা, নতুন গল্প, নতুন উপন্যাস। নতুনভাবে চিন্তা করেছেন রাষ্ট্রীয় জীবন ও সমাজ জীবনের কথা।

রাজনৈতিক ইতিহাসেও এসেছে একটি নূতন মাত্রা। জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে চলে যায়। শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, একে একে রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। একটি ঔপনিবেশিক জনপদ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সেই জনপদের মানুষ স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল, স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রীয় জীবন খুঁজে পেয়েছিল। একুশের ভাষা-আন্দোলনে যে জীবনের সূচনা, সেই জীবন চেতনা সফল হয়েছে একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয়। 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হলে ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছরের অব্যাহত স্বাধিকার চেতনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হবে।

ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনা পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। এই জনপদের মানুষ একদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। কথা বলার অধিকার ছিল না, স্বশাসনের অধিকার ছিল না, নিজের ভাগ্য নিজের মতো করে গড়ে তোলার রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না। আজ আমরা একটি রাষ্ট্রের অধিকার পেয়েছি, একটি নতুন সৃজনশীল সমাজ গঠনের সুযোগ পেয়েছি, পৃথিবীর মানচিত্রে স্বকীয় ভূখণ্ডের অধিকার অর্জন করেছি। ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণ করতে চাই তাঁদের যাঁরা এই দেশ, এই সমাজ ও এই রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত অগণিত মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে রাষ্ট্র আমরা অর্জন করেছি, আমরা যেন সহনশীলতায়, সহযোগিতায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি এই কামনা করি।

APR. 12 2002